বিষয়বস্তুঃ রমাযানের শেষ দশক

রমাযান মাসের তৃতীয় জুমুআর বয়ান

(১৮ রমাযান ১৪৪৫ হিজরী, ২৯ মার্চ ২০২৪)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১৩৮

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! আজ পবিত্র রমাযান মাসের ১৮ তারিখ, তৃতীয় জুমুআ। আজকেরে আমরা আলোচনা করব, রমাযানের শেষ দশক সম্পর্কে।

বিখ্যাত হাদীসের কিতাব সহীহ ইবনে খুযাইমার ১৮৮৭ নম্বর হাদীসে রমাযান উপলক্ষে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে ঐতিহাসিক ভাষণ বর্ণিত আছে, সেই ভাষণের মধ্যে নবীজি বলেছেনঃ أَوَّلُه رَحْمَةٌ রমাযানের প্রথম ভাগ রহমত, وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ আর দ্বিতীয় ভাগ মাগফিরাত। وَأٰخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ আর তৃতীয় ভাগ হল, জাহান্নাম থেকে মুক্তি অর্থাৎ নাজাত। আমরা প্রথম দশক রহমতের পর্ব শেষ করে এখন দ্বিতীয় দশকে মাগফিরাতের পর্ব অতিক্রম করছি। আর মাত্র ২ দিন পর আমরা তৃতীয় দশক নাজাতের পর্বে প্রবেশ করব, ইনশা আল্লাহ।

আসুন, আজকের আমরা প্রথমে একটু আত্মসমীক্ষা করে দেখি যে, রমাযানের প্রথম দশক রহমতের পর্বটি কীভাবে কাটালাম। প্রথমে একটি চমৎকার রহস্য লক্ষ্য করুনঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন রমাযানের এই ৩টি পর্বের মধ্যে পরস্পর কি সুন্দর ধারাবাহিক সম্পর্ক রেখেছেন। লক্ষ্য করুনঃ প্রথম পর্বটি হল, রহমত। রহমত মানে দয়া। আর দ্বিতীয় পর্ব হল, মাগফিরাত। মাগফিরাত মানে ক্ষমা। এ দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর দয়া শামিলে হাল না হলে, কখনও মাগফিরাত হবে না।

এরপর আবার লক্ষ্য করুনঃ তৃতীয় দশক হল, নাজাত। নাজাত মানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি। এখানেও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় দশকে ক্ষমা না হলে তৃতীয় দশকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি হবে না। অতএব বোঝা গেল, ৩টি পর্বের মধ্যে কি চমৎকার সম্পর্ক। এই ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে আত্মশুদ্ধির সুযোগ দিয়ে রেখেছেন।

এখন যদি কোন বান্দা প্রথম পর্বটি অবহেলায় কাটিয়ে দেয় অর্থাৎ প্রথম পর্বে রোযা, তারাবীহ ও অন্যান্য ইবাদতগুলি সঠিকভাবে আদায় না করে ফাঁকি দেয়, তাহলে আল্লাহর রহমত ও দয়া থেকে বঞ্চিত হবে। আর যখন সে প্রথম পর্বে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে, তখন দ্বিতীয় পর্বে মাগফিরাত অর্থাৎ ক্ষমা থেকেও বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা আল্লাহর রহমত ও দয়া ছাড়া ক্ষমা অসম্ভব। হ্যাঁ, তবে যদি বান্দা এই দ্বিতীয় পর্বে খাঁটি মনে তাওবা ইস্তেগফার করে এবং অত্যন্ত অনুনয় ও বিনয়ের সাথে

ইবাদতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে, তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তায়ালা দয়া করে মাগফিরাত করবেন। তবে শর্ত হল, তাওবাটি যেন 'তাওবায়ে নাসূহা' হয়। তাওবায়ে নাসূহা কাকে বলে জানেন ? তাওবায়ে নাসূহা বলা হয় এমন খাঁটি তাওবাকে, যার মধ্যে ৩টি শর্ত পাওয়া যাবে।

প্রথম শর্ত হল 'নাদামাত'। 'নাদামাত' মানে লজ্জা ও অনুতাপ। অর্থাৎ যে গোনাহগুলি করে ফেলেছে, সেগুলির উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার পর অন্তরে তার প্রায়শচিত্তের অনুশোচনা পয়দা হওয়া। যদি অন্তরে এমন অবস্থা পয়দা না হয়, তাহলে তাওবা কখনও কবুল হবে না। কেননা এই 'নাদামাত' হল, তাওবার মূল। এ জন্যই নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ "লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়ার নামই হল, তাওবা।"

দ্বিতীয় শর্ত হল, 'তারকে মা'সিয়াত' অর্থাৎ যে সমস্ত গোনাহে লিপ্ত আছে, সেই গোনাহগুলিকে প্রথমে ত্যাগ করা। মনে রাখবেন, গোনাহের মধ্যে লিপ্ত থেকে আমরা যতই আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই না কেন, আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন না।

একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন, যদি কেউ টয়লেটের চ্যাম্বারে নামে, তাহলে তার শরীর নিশ্চয় নাপাক হয়ে যাবে। এখন যদি সে চ্যাম্বার থেকে না বেরিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হালাল সাবান মেখে গোসল করে এবং তারপর গায়ে মুশকে আম্বার আতর মাখে, তাহলে সে পাক ও পবিত্র বলে গণ্য হবে কি ? তা কখনই না। অনুরূপভাবে বান্দা যদি প্রথমে গোনাহগুলি ত্যাগ না

করে, তাহলে যতই তাওবা করুক তাওবা কবূল হবে না।

সুধী বন্ধুগণ ! তাওবা কবূল হওয়ার তৃতীয় শর্ত হল, আগামীতে গোনাহ না করার উপর 'আযমে মুসাম্মাম' করা। 'আযমে মুসাম্মাম' মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর কোন গোনাহ না করার উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। যদি কোন বান্দা তাওবা করে আর মনে মনে পরিকল্পনা করে যে, দ্বিতীয়বার আবার সুযোগ পেলে গোনাহ করব, তাহলে তার তাওবা কখনও কবূল হবে না। অতএব আন্তরিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, জীবনে আর কোনদিন গোনাহ করব না।

সম্মানিত ঈমানদার বন্ধুগণ ! আসুন আমরা পবিত্র রমাযানের এই দ্বিতীয়পর্বে তাওবায়ে নাসূহার ৩টি শর্তকে মাথায় রেখে খাঁটি মনে তাওবা ও ইস্তেগফার করি এবং গোটা জীবনের জন্য গোনাহের রাস্তা ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসি। এখনও সময় আছে। উর্দুতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে,

صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر لوٹے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں

"সকালের ভোলা মানুষ সন্ধায় ঘরে ফিরে আসলে, তাকে ভোলা বলা হয় না। বোঝা গেল, গোনাহের পর খাঁটি মনে তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে সে আর গোনাহগার থাকবে না।

মনে রাখবেন, যদি কোন বান্দা পৃথিবী সমান গোনাহ নিয়ে আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তাওবায়ে নাসূহা ও ইস্তেগফার করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তার সমস্ত গোনাহ অবশ্যই ক্ষমা করবেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সুনানে তিরমিযীর ৩৫৪০ নম্বর

হাদীসে আনাস ইবনু মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ يَا ابْنَ أَدَمَ ! اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلى مَا كَانَ فِيْكَ وَلَا أُبَالِي "হে বনী আদম ! যদি তুমি আমাকে মাগফিরাতের আশায় (অন্তর দিয়ে) ডাক, তাহলে আমি আল্লাহ তোমার আমলনামায় যত গোনাহ থাকুক না কেন সব গোনাহ ক্ষমা করে দিব। এ বিষয়ে আমি কোন পরওয়া করব না।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেছেনঃ يَا ابْنَ أَدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ الْسَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلَا اُبَالِي "হে বনী আদম ! যদি তোমার গোনাহ আকাশের মেঘমালা পর্যন্তও পৌঁছে যায়, অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলে আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিব। আমি কোন পরওয়া করব না।

অতঃপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন আবার ঘোষণা দিয়ে বলেন, يَا ابْنَ أَدَمَ ! اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً "হে বনী আদম ! যদি তুমি আমার দরবারে পৃথিবী সমান গোনাহের বোঝা মাথায় নিয়ে এমন অবস্থায় হাজির হও যে, তুমি আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করোনি, তাহলে আমি তোমার ওই রকম পৃথিবী পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে হাজির হব। সুব্হানাল্লাহ ! আল্লাহ তায়ালা কতই না দয়ালু। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু আমরা ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রস্তুত নই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুমতি দান করুন, আমীন।

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! আজকের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল, শেষ দশকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ আমল। আমরা একটু আগেই হাদীসের আলোকে জানতে পারলাম যে, রমাযানের শেষ দশক হল নাজাতের পর্ব। মনে রাখবেন, একজন ঈমানদার ব্যক্তির সবচেয়ে বড় মহাবিপদ হল জাহান্নাম। সেই জাহান্নাম থেকে মুক্তির নাম হল, নাজাত।

এই নাজাত সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে প্রথমে আমরা একটি উদাহরণ লক্ষ্য করি। ধরুন, আমার আপনার সামনে একটি মহাবিপদ এসেছে। আমরা সেই বিপদ থেকে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু কোন উপায় বের হল না। ঠিক এমন মুহূর্তে যদি কেউ আমেদেরকে বলেন যে, এই বিপদ থেকে বাঁচতে হলে কিছু করণীয় কাজ আছে। তাহলে কি আমরা সেই কাজগুলি করব না, নাকি ? অনুরূপভাবে এই রমাযানের তৃতীয় পর্বে জাহান্নামের মহাবিপদ থেকে নাজাত অর্জন করতে হলে, কিছু করণীয় আমল আছে। সেগুলি যদি সাধ্যানুযায়ী আমল করতে পারি, তাহলে আশা করা যায় আমি আপনি নাজাত অর্জন করতে পারব।

মুহ্তারম উপস্থিতি ! এই শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ প্রধান আমল হল, প্রতিটি রাতে বিশেষ করে বিজোড় রাতগুলিতে কুরআন তিলাওয়াত কিংবা কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে কদর সন্ধান করা। আর মাত্র ২ দিন পর থেকে আমাদেরকে এ আমল করতে হবে। তারাবীহ ছাড়াও কিছু অতিরিক্ত নফল নামায আমরা আদায় করব, ইনশা আল্লাহ।

তবে জানার বিষয় হল, কুরআনের মাধ্যমে কদর কেন সন্ধান করতে হবে ? মনে রাখবেন, রমাযানের এই শেষ দশকের ফযীলতের মূল কারণ হল, কদরের রাত। আর এই কদরের রাতের ফযীলতের মূল কারণ হল, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের অবতরণ। এ দু'টি মূল কারণ মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, এই শেষ দশকে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন শ্রবণের মাধ্যমে কদর সন্ধান করা উচিৎ। আর এই কদরের সাথে যে কুরআনের নিগুড় সম্পর্ক আছে, সেটা কিন্তু আমি নিজে বানিয়ে বলছি না বরং আল্লাহ রব্বুল আলামীন স্বয়ং নিজেই কুরআন করীমের মধ্যে সূরা কদর নামে একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করে বলেছেনঃ আমি এই কদরের রাতেই কুরআন নাযিল করেছি। সূরা কদরের প্রথম ৩ টি আয়াত লক্ষ্য করুন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেনঃ

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۞ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۞

"নিশ্চয় আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি কদরের রাত্রে। আর তোমরা কি জান, কদরের রাত কী ? কদরের রাত হল, এক হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" এক হাজার মাস মানে, ক্যালকুলেটারে হিসাব করে দেখবেন প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস হয়। অর্থাৎ এই রাতে যদি কোন ঈমানদার বান্দা কদর পেয়ে যায়, তাহলে তার আমলনামায় ৮৩ বছর ৪ মাসের ইবাদত লিখে দেওয়া হবে, সুবহানাল্লাহ।

এখন প্রশ্ন হল, কদর মানে কী ? মনে রাখবেন, কদর শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কিরামগণ ৩টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। আমরা

ওই ৩ টি অর্থ খেয়াল রেখে শেষ দশকে কদর সন্ধান করব, ইনশা আল্লাহ।

(১) 'কদর' মানে ভাগ্য বা তাকদীর। তাফসীরে কুরতুবীতে সূরা কদরের ব্যাখ্যায় মুফাসসির সম্রাট আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই পবিত্র রজনীতে ৪ জন দায়িত্বশীল ফেরেশতা জিবরাঈল, ইসরাফীল, মিকাঈল ও আযরাঈল আলাইহিমুস সালামদেরকে ডেকে সমস্ত বান্দাদের পূর্ণ এক বছরের ভাগ্যলিপি তাদের হাতে তুলে দেন। সেজন্য এই রাতকে 'লাইলাতুল কদর' অর্থাৎ ভাগ্যের রাত বলা হয়।

(২) কদর মানে বিশেষভাবে কবূল করা। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ রাতে বান্দার যাবতীয় আমল বিশেষভাবে কদর করেন অর্থাৎ গ্রহণ করেন, তাই এ রাতকে বলা হয় 'লাইলাতুল কদর' অর্থাৎ কবূলিয়াত ও গ্রহণের রাত।

(৩) আরবী ভাষায় কদরের আরেকটি অর্থ হল, মর্যাদা ও সম্মান। যেহেতু আল্লাহর নিকটে এ রজনীটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও সম্মানিত, তাই এ রাতের নাম হল 'লাইলাতুল কদর' অর্থাৎ মহা সম্মানিত রাত।

যাইহোক এ রাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে তাসবীহ, তিলাওয়াত, নফল ইবাদত যা কিছু আদায় করার তাওফীক দিক না কেন, সেই ইবাদতগুলি অত্যন্ত খুশু খুযূর সাথে আদায় করব। অতঃপর যখন বিনয়তা ও আন্তরিকতার সাথে দুআ করব, তখন এই ৩ টি অর্থ খেয়াল রেখে আল্লাহর কাছে কদর প্রার্থনা করব, ইনশা আল্লাহ।

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমাদের জানার বিষয় হল, কীভাবে ও কোন পন্থায় এই কদর পাওয়া সম্ভব ? এ সম্পর্কে আমাদেরকে ফলো করা দরকার নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীদের আমল। তারা যেভাবে কদর সন্ধান করেছেন, সেভাবেই কদর সন্ধান করা উচিৎ।

মনে রাখবেন, সমস্ত হাদীসের কিতাব ও সীরাতের সমস্ত কিতাবগুলিতে দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, শেষ দশকে কদর সন্ধানের জন্য নবীজি ও সাহাবাগণ বিশেষভাবে দু'টি আমল করেছেন। (১) পূর্ণ ১০ দিনের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়া ইতেকাফ, (২) রমাযানের অন্য দিনগুলি অপেক্ষা ওই ১০ দিনে ইবাদতে কঠোর পরিশ্রম করা। এই দু'টি আমল ছাড়া কদর পাওয়া সাধারণত অসম্ভব।

জেনে রাখা দরকার, দ্বিতীয় হিজরীতে রমাযানের রোযা ফরয হওয়ার পরে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত বছর বেঁচে ছিলেন, প্রত্যেক বছরে কদর সন্ধান করার জন্য তিনি ইতেকাফ করেছেন এবং এই রাতগুলিতে বিশেষ করে বিজোড় রাতগুলিতে বেশি বেশি নফল ইবাদাত করেছেন। নবীজি শুধু নিজে নয়, বরং নিজের পরিবারদেরকেও রাত জেগে নফল ইবাদত করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। তারাবীর পর অল্প সামান্য বিশ্রামের পর তাদেরকে জাগিয়ে দিতেন। এ সম্পর্কে প্রথমে আমরা দু'টি হাদীস লক্ষ্য করি।

প্রথম হাদীসঃ সহীহ মুসলিমের ১১৭৫ নম্বর হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি

বলেছেনঃ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِه "রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে নফল ইবাদত আদায়ে যতটা পরিশ্রম করতেন, ততটা অন্য সময়ে করতেন না।" বোঝা গেল, শেষ দশকে সবচেয়ে বেশি ইবাদতে পরিশ্রম করতেন। আর আমরা শেষ দশকে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করি ঈদের কেনা কাটায়। আল্লাহ আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

দ্বিতীয় হাদীস লক্ষ্য করুনঃ সহীহ বুখারীর ২০২৪ নম্বর হাদীসে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ যখন রমাযান মাসের শেষ দশক প্রবেশ করত, তখন নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরনের লুঙ্গি মজবুত করে বেঁধে নিতেন। অর্থাৎ কঠোর পরিশ্রম করতেন। এর ব্যাখ্যা স্বরূপ তারপরেই বলা হয়েছেঃ অর্থাৎ তিনি শেষ দশকের রাতগুলি জেগে থেকে নফল ইবাদত করতেন এবং নিজের পরিবারদেরকেও জাগ্রত রাখতেন।" আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আসন্ন শেষ দশকে মসজিদে ইতেকাফ করে কদর সন্ধান করার তাওফীক দান করুন।

মুহতারম ভাই সকল ! জেনে রাখা দরকার, ইতেকাফ ৩ প্রকার। (১) ওয়াজিব ইতেকাফ, (২) সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ইতেকাফ, (৩) নফল ইতেকাফ।

ওয়াজিব ইতেকাফ বলা হয়, যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে ইতেকাফ করার মান্নত মানে, তাহলে তার উপর সেই ইতেকাফ ওয়াজিব হয়ে যাবে। চাই সেটা রমাযান মাসে হোক কিংবা রমাযান

ছাড়া অন্য কোন মাসে হোক।

আর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ইতেকাফ বলতে সেই ইতেকাফকে বলা হয়, যেটা নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাযান ফরয হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক রমাযানের শেষ দশকে নিয়মিত পালন করেছেন। রমাযান মাসের শেষ দশক ছাড়া এই ইতেকাফ আদায় হয় না। ফুকাহায়ে কিরামগণ বলেছেনঃ যেহেতু নবীজি নিয়মিত পালন করেছিলেন, সেজন্য এটা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। আর যেহেতু সকল সাহাবীকে আদায় করা জরুরী করে দেন নি, তাই এটাকে বলা হয় কিফায়াহ অর্থাৎ মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকে কমপক্ষে একজন আদায় করলেও হয়ে যাবে।

আর নফল ইতেকাফ বলা হয় সাধারণ ইতেকাফকে। যেটা আদায় করা সুন্নাতও না, আবার জরুরীও না। অনুরূপভাবে এর জন্য কোন নির্দিষ্ট মাস বা নির্ধারিত সময় লাগে না। একদিন দু'দিন, একঘন্টা দু'ঘন্টা, একমিনিট দু'মিনিট যখন যতটা সম্ভব করা যায়। আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করবেন, নফল ইতেকাফের নিয়্যাত করে প্রবেশ করুন। আপনার জামাআতের সাথে নামায আদায়ের সাওয়াবও হল, তার সাথে সাথে ইতেকাফের সাওয়াবও হাসিল হল। শুধুমাত্র নিয়্যাত করে নিলেই হয়ে যাবে।

যাইহোক এখন বলার কথা হল, আমরা যারা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ কিফায়াহ ইতেকাফ করব, তারা আগামী রবিবার ২০ রোযার আসরের পর ইফতারের পূর্বেই মসজিদে ১০ দিনের প্রয়োজনীয় সামানপত্র নিয়ে হাজির হয়ে যাব।

আরেকটি মাসআলা জেনে রাখা উচিৎ যে, এই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ইতেকাফ ১০ দিনের কম হয় না। অনুরূপভাবে এটাও জেনে রাখা দরকার যে, যদি গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন একজনও এই ইতেকাফ না করে, তাহলে সকল গ্রামবাসী গোনাহগার হবে। তবে ১০ দিনের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ইতেকাফকারীর সঙ্গে যদি কেউ ৫ দিন কিংবা ৩ দিন অথবা একদিনও ইতেকাফ করে, তাহলে সেটা তার জন্য নফল ইতেকাফ হবে। এতেও সে ব্যক্তি সাওয়াব পাবে।

সুধী বন্ধুগণ ! গ্রামে শুধু একজন সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ইতেকাফ আদায় করবেন কেন ? অধিক সংখ্যায় এই ইতেকাফ করা উচিৎ। যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে তার একাকীত্ব দূর করার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে আরও কয়েকজন পালাক্রমে ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিনের নফল ইতেকাফের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। একা একজন গোটা গ্রামবাসীর গোনাহের বোঝা সরানোর দায়িত্ব নিবে কেন ? সুতরাং এই ইতেকাফে সকলকে অংশ নেওয়া উচিৎ।

যদি একটি গ্রামে এভাবে ইতিকাফের ব্যবস্থা করা হয় যে, দু'একজন পূর্ণ ১০ দিনের সুন্নাত ইতেকাফ করবে, আর কয়েকজন পালাক্রমে ১ দিন, ২ দিন, ৩ দিন করে যার যতদিন সম্ভব নফল ইতেকাফ করবে, তাহলে আর পারিশ্রমিক দিয়ে ইতেকাফে বসানোর মতো নাজাইয কাজ করতে হবে না। যেটা বর্তমান বহু গ্রামে কেউ থাকতে রাজি হয়না তাই করা হচ্ছে।

মনে রাখবেন, ফাতাওয়ার সমস্ত কিতাবে লেখা আছে, পারিশ্রমিক দিয়ে কাউকে ইতেকাফে বসালে ইতেকাফ আদায় হবে

না, বরং সকলে গোনাহগার হবে। ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬ খণ্ড ৫১২ পৃষ্ঠা। তবে পারিশ্রমিকের চুক্তি ছাড়া কেউ যদি ইতেকাফে বসেন, আর তাকে কেউ খুশি করে হাদিয়া দেয়, তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হল, যেন ওই অঞ্চলে এমনভাবে হাদিয়া দেওয়ার পূর্ব প্রচলন না থাকে। ফুকাহায়ে কিরামগণ এভাবেই লিখেছেন।

যাইহোক আমাদের উদ্দেশ্য হল, ইতেকাফ অবস্থায় কদর সন্ধান করা। অতএব পূর্ণ ১০ দিনের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ইতেকাফ তো কমপক্ষে একজনের হতেই হবে। এছাড়া যদি কেউ পূর্ণ ১০ দিন না করতে পারে, তাহলে তার থেকে কম যতদিন সম্ভব ততদিন নফল ইতেকাফ করবে। আর যদি কারোর পক্ষে এটাও সম্ভব না হয়, তাহলে কমপক্ষে যখনই মসজিদে নামাযের জন্য প্রবেশ করবে, তখনই ইতেকাফের নিয়্যাত করে প্রবেশ করবে। মোটকথা এই শেষ দশকে আমরা কেউ যেন ইতেকাফের সাওয়াব থেকে খালি না থাকি। তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে কদর নসীব করবেন। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রমাযানের শেষ দশকটি ইতেকাফ ও ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর তাওফীক দান করুন, আমীন।